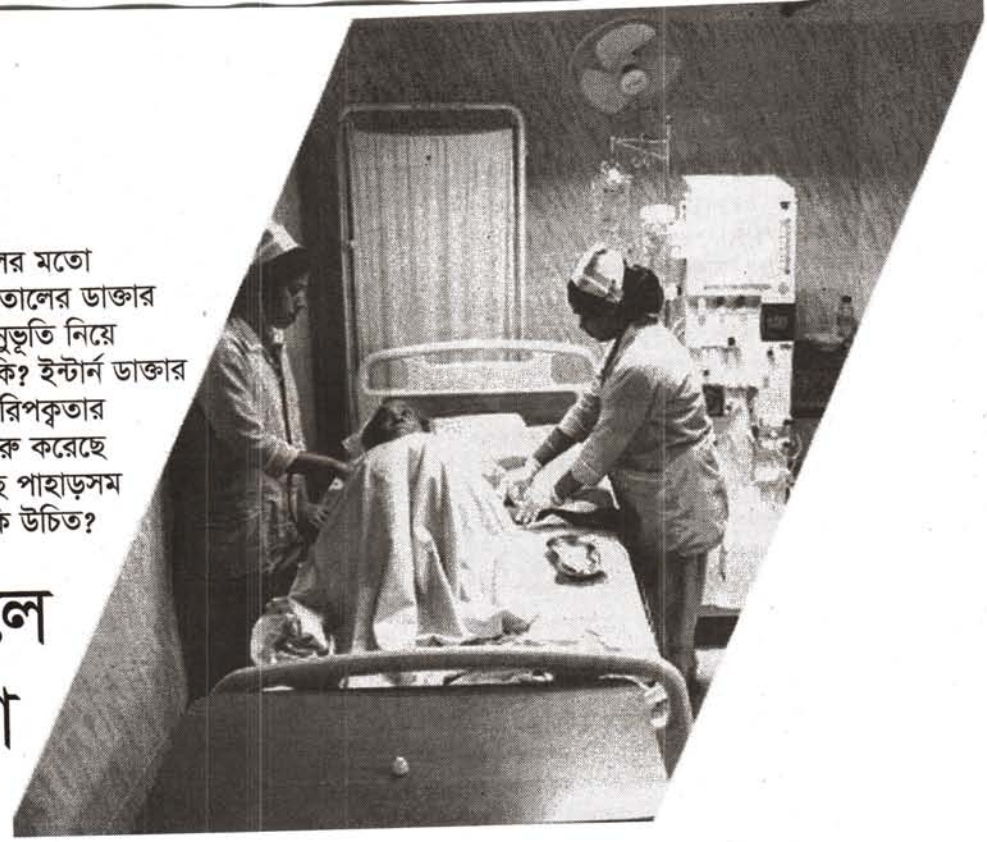

ঢাকা মেডিক্যালের মতো পাবলিক হাসপাতালের ডাক্তার আর রোগীর অনুভূতি নিয়ে আমরা ভাবছি কি? ইন্টার্ন ডাক্তার তো মানসিক পরিপক্বতার পরীক্ষা দেয়া শুরু করেছে মাত্র, তার কাছে পাহাড়সম প্রত্যাশা করা কি উচিত?

কর্মস্থলে সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা

● হুমায়ূন আজম রেওয়াজ

যাপিত জীবনের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত কত না সম্পর্কে জড়াতে হয় আমাদের। পরিবার-পরিজন, প্রিয়জন কিংবা স্বজনের গণ্ডি পেরিয়ে এ সম্পর্কের মূল ভিত্তিই হলো প্রয়োজন। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে, খাবারের জন্য হোটেলে, সাজতে হলে পার্লারে কিংবা পড়তে হলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন অজস্র গন্তব্য মিশে আছে আমাদের দৈনন্দিনতায়। ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন, সেবাদাতা-গ্রহীতা এই বিষয়গুলো বরাবরই ন্যূনতমভাবে দ্বিপাক্ষিক। আর একাধিক পক্ষ থাকা মানেই সম্পর্কের অজস্র প্রকরণ থাকতে বাধ্য। এ সম্পর্কের স্থায়িত্ব খুবই স্বল্পকালীন কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে মোটেও অবহেলাযোগ্য নয়। চলতি বছরে বিভিন্ন পেশাদার লোকজনের সঙ্গে সেবাগ্রহীতা বা সাধারণ মানুষের বাকবিতণ্ডা, মারামারির মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যাপকহারে ঘটেছে। দোষ যে পক্ষেরই হোক না কেন, বিষয়টি দুঃখজনক এবং সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে চরম নেতিবাচকতাকে ইঙ্গিত করে।

'শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর', 'চিকিৎসা একটি মহান পেশা', 'পুলিশ জনগণের বন্ধু'– এ কথাগুলো সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত। এ কথাগুলো সত্যিই তো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশে কী ঘটছে? দেশের শীর্ষ তিন মেডিক্যালে (বারডেম, রামেক, ঢামেক) মারামারি, বদলির জন্য শিক্ষা কর্মকর্তাকে শিক্ষকদের ঘুষ প্রদান, র‍্যাবের হাতে অপহরণ (!), পুলিশি হয়রানি ইত্যাকার ঘটনা যখন পত্রিকার শিরোনাম হয়, তখন ভিন্নভাবে ভাবতেই হয়। আবার একই সময়ে যখন ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত, শিক্ষকের হাতে ছাত্রী লাঞ্ছিত এমন খবর দেখি তখন মাথা হেঁট হয়ে যায়। অবক্ষয়টা দুদিক থেকেই শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণসেবা খাতের দুরবস্থা আমরা এক ধরনের মেনেই নিয়েছি। লোকবল সঙ্কট, অবকাঠামোর দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, অর্থ সঙ্কট প্রভৃতি মিলিয়ে অবস্থা বেশ নাজুক বলা চলে। শহরের বাইরে সচরাচর কেউ থাকতে চায় না। সরকারি চাকরি মানেই ন্যূনতম বেতন সুতরাং মেধাবীরা কেউ তেমন উৎসাহী নন। বেসরকারি চাকরিতে নিরাপত্তা নেই। বাধ্য হয়ে অনেকেই আসছেন পাবলিক সেক্টরে কাজ করার জন্য। আর বিপুল জনগোষ্ঠীর এ দেশে চাহিদার তুলনায় জোগান বরাবরই অপ্রতুল। এসব কারণে একটা নেতিবাচক ধারণা মোটামুটিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সরকারি কাজে আঠারো মাসে বছর, ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না, তদবির ছাড়া কাজ হবে না। এসবের পেছনে নানান যুক্তি ও কারণ মেনে নিয়েই বলছি, সেবাগ্রহীতার এমন মানসিক ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কাজ করা দুরূহ এবং অসম্মানজনক। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক চেহারাটা বাছবিচার না করেই তার সমান্তরাল সুবিধা কামনা করা বোকামি নয় কি? পরিবর্তন তাহলে কোন পথে আসবে?

হরিবন্ধু দাশ একজন সাধারণ গৃহস্থ, ছেলে থাকে বিদেশে এবং একটি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠায়। এমনি একদিন হরিবন্ধু রেমিট্যান্স হাউসের মাধ্যমে পাঠানো টাকা তুলতে এলেন। হরিবন্ধুকে বসতে বলা হলো, রেমিট্যান্স হাউস থেকে কাস্টমার কপি ডাউনলোড করতে হবে, প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দিতে হবে, কিছু সময় তো প্রয়োজন। ইন্টারনেট স্পিড কম হওয়ায় সময় একটু বেশিই লাগল। হরিবন্ধু অনেকটা অসহায় হয়ে বলেই ফেললেন, 'স্যার এত কষ্ট দিলেন, আপনারে না হয় দিতাম কিছু।' হরিবন্ধু ইন্টারনেট বোঝে না, এন্ট্রি বোঝে না। তাকে রাগ দেখানো গেল না। বেচারা তরুণ ব্যাংকার অনন্যোপায় অপমান হজম করে বসে থাকে। হরিবন্ধুর মতো আরো অনেকেই বুঝে না বুঝে, আত্মীয়ের জোরে, প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙিয়ে, জেনে না জেনে এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলে, একটা বাড়তি আবদার করে বসে। এ তো গেল অশিক্ষা আর অজ্ঞতার কথা আর শিক্ষিতদের মনোভঙ্গিটা প্রায় হয়ে ওঠে আদেশমূলক। সেবাগ্রহীতার প্রস্তুতি তথা মনোভঙ্গি পাল্টানো উচিত নয় কি?

রাস্তায় সিগন্যালে আটকা পড়লেই খিস্তিখেউর ওঠে পাবলিক বাসে কিন্তু রাস্তার ওপারের জ্যাম ভাবনায় আসে কি? রং সাইডে ঢুকিয়ে দেয়া গাড়ি, ওভার ব্রিজের নিচ দিয়ে পার হওয়া, ফুটপাতে বাইক তুলে দেয়া, মার্কেটের সামনে পার্কিং করার সময় নিজের নাগরিক দায়িত্ব কতটা পালন করি আমরা? ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান কোথায়? অনিয়মের সঙ্গে সখ্য অথবা বিপরীত অনিয়মও সমান অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয় কি? আজ প্রায় প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠছে। প্রশ্ন হলো এই প্রশ্ন কিনছে কারা? রুগ্‌ণ প্রশাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমাদের নাগরিক দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই, তাতে সমাজেরই অমঙ্গল। জবাবদিহিতার সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রয়োজন আছে এবং তার

গতিধারাও বুঝে নেয়ার সময় এসেছে।

একটি নামিদামি মোবাইল কোম্পানির কাস্টমার কেয়ারে কাজ করত প্রীতম। ভালো বেতন, ব্র্যান্ড ভ্যালু, পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়, করপোরেট দুনিয়ার অভিজ্ঞতা– সব মিলিয়ে লোভনীয় চাকরি কিন্তু বছর না ঘুরতেই ছেড়ে দিল! কেন? ক্ষুব্ধ উত্তর, কাস্টমার আমাদের মানুষ মনে করে না। ফোন করেই অশ্রাব্য গালাগালি, ধমকের সুরে কথা বলে। এটা খুব অপমানজনক। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো বাজে অভিজ্ঞতা হয়। এটা কি বাঞ্ছনীয়? নুসরাত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী। সপ্তাহ খানেক ধরে বেশ ক্ষুব্ধ স্ট্যাটাস দিচ্ছে। যেমন– 'এমবিবিএস পাঠ্যক্রমে কুংফু-কারাতে নামে একটি কোর্স যোগ করা হোক।' এর বিপরীতে কোনো এক ফেসবুক ইউজার একটি কার্টুনসহ স্ট্যাটাস দিয়েছে– 'ডাক্তাররা এবার খ্যামা দে, এত চ্যাতস ক্যারে।' দুই স্ট্যাটাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লাইক, কমেন্টস। আমরা কোন পক্ষে? আসলে পক্ষ নেয়ার কিছু আছে কি? ঢাকা মেডিক্যালের মতো পাবলিক হাসপাতালের ডাক্তার আর রোগীর অনুভূতি নিয়ে আমরা ভাবছি কি? ইন্টার্ন ডাক্তার তো মানসিক পরিপক্বতার পরীক্ষা দেয়া শুরু করেছে মাত্র, তার কাছে পাহাড়সম প্রত্যাশা করা কি উচিত? এই মারামারি, অবরোধ কি আমরা চেয়েছিলাম? তাহলে সমস্যাটা বার বার হচ্ছে কেন? আমার দৃষ্টিতে ক্রমেই নাগরিকতা ও যান্ত্রিকতায় পিষ্ট মানবিক ও নাগরিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় এ জন্য দায়ী। তা না হলে আক্রমণকারীর পরিচয় ঢাবি ছাত্র, ছাত্রনেতা, ডাক্তার এমন হবে কেন? আবার চিকিৎসকদের ধর্মঘটও কি সুস্থ প্রতিবাদ? ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কী? ব্যক্তি তো আর প্রতিষ্ঠান নয়! তাহলে প্রতিষ্ঠানকে জড়িয়ে এ কুরুক্ষেত্র রচনা কেন?

নাগরিক জীবনে এমন অজস্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার ঘনঘটা। এই বিচ্ছিন্নতা তীব্র হচ্ছে ক্রমেই। পেশাদার অঙ্গনে একটি জটিল সমস্যা হলো নানান বয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করা। বয়স সমস্যা নয়, যদি না অধস্তন কেউ বর্ষীয়ান হয়। আবদুল আজিজ একটি প্রতিষ্ঠানে পিয়নের কাজ করছে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেই ফেলে– ত্রিশ বছর ধরে চা আনতেছি, আর কত? সত্যিই তো! আর কত? কিন্তু তার কাজই যে এটা! এমন পরিস্থিতি প্রায় প্রতিটি অফিসে। তরুণ অফিসার আদেশের সুরে আজিজকে বলতে পারে না আবার কর্তৃত্ব বজায় না রাখলে অফিস চলে না। দূরদর্শী কর্মকর্তা শুরুতেই একটা সম্মানজনক সমঝোতা তৈরি করে নেন। এর জন্য উচ্চ ডিগ্রির দরকার নেই, দরকার একটু দূরদর্শিতা আর মানবিক বোধ। অফিসের নবাগত তরুণী সহকর্মীকে ঘিরে একঝাঁক অযাচিত প্রেমিক কিংবা পাণিপ্রার্থী দাঁড়িয়ে গেলে তা ওই তরুণীর জন্য কতটা স্বস্তিদায়ক? আপনার তরুণী সহকর্মী স্বস্তিতে আছে কি?

এমন অজস্র প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই। নেতিবাচক উদাহরণ টানতে চাই না, কাউকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করাও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ক্রমেই সামাজিক ব্যাধি হয়ে ওঠা এই সমস্যাকে লোকভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা। পেশাদার অঙ্গনে এর বিপরীত চিত্রও আছে অবশ্যই, না হলে সমাজটা টিকে থাকে না। কিন্তু শুধু টিকে থাকা দিয়ে যে আর বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না। ছিঃ শিক্ষক/পুলিশ/ছাত্র/ডাক্তার এমন শিরোনাম চাই না নিশ্চয়ই। এর দায় সরকার, পুলিশ, রাজনৈতিক দল, আকাশ সংস্কৃতি আর বিশ্বায়নের ওপর চাপিয়ে সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকার জো নেই। আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে এসব সম্পর্কের সুষমা আবিষ্কার ও পরিচর্যা করতে হবে। আজকাল প্রায় সব বড় বড় করপোরেট হাউস কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস খুলেছে। উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী লাভজনক ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা। এটা কি শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক, নাকি এর মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বিদ্যমান? আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই না হয় গ্রহণ করলাম। তা না হলে তো এটা রোবটিক সমাজ হয়ে উঠবে। শুধু দেয়া আর নেয়ার সম্পর্ক। তা নিশ্চয়ই চাই না আমরা। এই ভাবনাগুলো আমাদের আলোড়িত করুক, পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর মানবিকতার সম্পর্ক বিকশিত হোক পেশাদার অঙ্গনে, মানুষ হোক মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নিবেদিত। ■

এলোমেলো ইচ্ছে

মুনিরা তাসনীম কারিম, ঢাকা

ইচ্ছে হয় এখুনি ঝাঁপ দেই প্লেন-এর জানালা দিয়ে। ইচ্ছে হয় চলন্ত ট্রেনের ছাদে হারিয়ে যাই বন্ধুদের সঙ্গে কোনো অজানা পথে। ইচ্ছে হয় স্কুলের পিচ্চিগুলোকে নিয়ে ঘুরে আসি নিজের শৈশবে। ইচ্ছা হয় খুব ভালবাসতে। ইচ্ছে হয় ভালবাসার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সারারাত বসে থাকি আগুলিয়ার নদীর কাছে। ইচ্ছে হয় মিশে যাই মেঘ ভেলার সঙ্গে। ইচ্ছে হয় পৃথিবীর সব অশ্লীলতাকে মুছে ফেলতে। ইচ্ছে হয় সব অনিয়মের প্রতিবাদে নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে ফেলতে। ইচ্ছে হয় সব শিশুশ্রমের কষ্টকে নিজের মাঝে কেড়ে নিতে। ইচ্ছে হয় গাজার শিশুগুলোকে নিয়ে আসি নিজের বুকের কাছে। ইচ্ছে হয় দেশটাকে আরো সুন্দর করতে। ইচ্ছে হয় দেশের সব মানুষের মাঝে সততার জয় দেখতে।

বঞ্চিত-লাঞ্ছিতদের পাশে

মানুয়েল মারাক, নটর ডেম কলেজ

জীবনটাকে নিয়ে ধ্যান করার সময় আমার প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে যদি মানুষের জন্য কিছু করে রেখে যেতে না পারি তাহলে জীবনটাই বৃথা থেকে যাবে। জানি না মানুষের মঙ্গলের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারব। তবে আমার ইচ্ছা মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। আমার ইচ্ছা একজন সাংবাদিক ও লেখক হয়ে যারা নির্যাতিত-নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সুখ-দুঃখের কথা সবার কাছে পৌছানো। সত্যি কথা আমার একটুকুও ইচ্ছা নেই লেখক-সাংবাদিক হয়ে যশ-খ্যাতি অর্জন করা। আমার শুধু ইচ্ছা যারা অসহায় ও অধিকারবঞ্চিত তাদের কথা সবার কাছে জানানো এবং যারা অন্যায় ও অপকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরা। ■

এই বিভাগে আপনিও লিখুন
জানান আপনার ইচ্ছের কথা
ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
ঢাকা-১২১৫, ই-মেইল : newarticle2000@gmail.com